বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে?

ভিক্টর স্টেঙ্গার

অনুবাদঃ প্রদীপ দেব

১৯৯২ সালে কস্‌মিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার (COBE)* স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো যখন প্রথমবারের মত জনসমক্ষে প্রকাশিত হলো, এই মিশনের বিজ্ঞানী জর্জ স্মুট** মন্তব্য করলেন, “আপনি যদি ধার্মিক হয়ে থাকেন, এটা অনেকটা ঈশ্বরের মুখোমুখি হওয়ার মতো”। প্রচার মাধ্যমগুলো লুফে নিল এই মন্তব্য। একটা ট্যাবলয়েট পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এ খবরের সাথে দেখা গেলো মহাবিশ্বের ঝাপসা আবহের মাঝে ভাসছে মধ্যযুগের শিল্পীদের আঁকা যীশুখ্রিস্টের মুখ।

১৯৯৮ সালে বার্কলের সেন্টার ফর থিওলজি এন্ড সায়েন্স-এ অনুষ্ঠিত “সায়েন্স এন্ড দি স্পিরিচুয়েল কোয়েস্ট” কনফারেন্সের রিপোর্ট প্রকাশ করতে গিয়ে নিউজউইক তাদের ২০ জুলাই সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে একেবারে ঘোষণাই দিয়ে দিল “বিজ্ঞান ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে”।

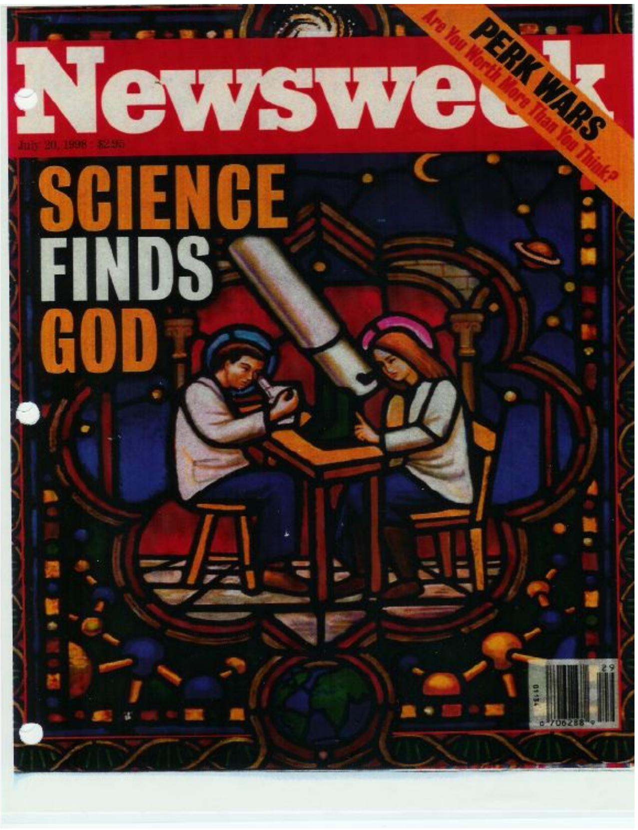

সেই কনফারেন্সে উপস্থিত কয়েক শ' বিজ্ঞানী ও থিওলজিয়ান আপাতদৃষ্টিতে সর্বসম্মতিক্রমে একমত হয়েছে যে বিজ্ঞান ও ধর্ম ক্রমশ একে অপরের সাথে মিলে যাচ্ছে। আর যে বিষয়ে বিজ্ঞান ও ধর্ম একে অপরের সাথে মিশে যাচ্ছে সে বিষয়টা হলো 'ঈশ্বর'। দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও কোয়েকার (Quaker)*** জর্জ এলিস তাঁর বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করলেন এভাবে, "বিপুল পরিমাণ তথ্য ও উপাত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সমর্থন করছে। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কীভাবে এর মূল্যায়ন করবো"।

নিউজউইকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমশ অগ্রগতির ফলে মনে হতে পারে যে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের বিরোধ বাড়ছে এবং ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস কমে যাচ্ছে"। কিন্তু যাই হোক, "ক্রমবর্ধমান সংখ্যক বিজ্ঞানী বলছেন, এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত শক্ত করছে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষেই ইঙ্গিত করছে"। প্রতিবেদনটি আরো জানাচ্ছে, "পদার্থবিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে পারছেন যে মহাবিশ্ব একজন স্রষ্টার হাতেই বিশেষ ভাবে তৈরি হয়েছে প্রাণ ও চেতনার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে"। এ প্রতিবেদনে বিগ ব্যাং জ্যোতির্বিদ্যা, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ক্যায়োস থিওরি সব কিছুকেই বলা হচ্ছে "ঈশ্বরের এক একটি প্রবেশ পথ - যা দিয়ে ঢুকে ঈশ্বর এ পৃথিবীতে কাজ করেন"।

কিন্তু প্রতিবেদনে যতই বলা হোক "ক্রমবর্ধমান সংখ্যক" বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের সপক্ষে প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছেন, কোন জরিপে কিন্তু সেরকম দেখা যাচ্ছে না। আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স এর সদস্যদের ওপর চালানো সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৭% সদস্য ব্যক্তিগত সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন। ১৯৩৩ সালে এ বিশ্বাসের হার ছিল ১৫% এবং ১৯১৪ সালে এ হার ছিল ২৯%। আর যাই হোক, বেশির ভাগ বিজ্ঞানী ধর্মীয় বিশ্বাসের দিকে ঝোঁকার চেয়ে ধর্ম-বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন এটাই সত্য।

দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানীদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আমরা যা শুনছি তা বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর কথা নয়, তা আসলে বিশেষ একটা গোষ্ঠীর অর্থপুষ্ট একটা ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়ের গলাবাজি। বার্কলেতে যে সম্মেলন হয়েছে তা একধরণের সংরক্ষণবাদী সম্মেলন যেখানে কিছু শিক্ষাবিদ তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানীদের স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কোন দরকারই হচ্ছে না।

সীমানা পেরোনোর চেষ্টা

বার্কলে মিটিং সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিউইয়র্ক টাইম্‌স এর বিজ্ঞান লেখক জর্জ জনসন বলেছেন, "মনে হচ্ছে সাম্প্রতিক কালে ধর্মবিশ্বাসীরা তাদের সীমা অতিক্রম করতে চাইছে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। তারা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্তকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইছে যেন তা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমর্থন করে"।

ধর্মবিশ্বাসীদের বেশির ভাগের কাছেই ঈশ্বর বিহীন বিশ্বে জীবন ধারণ অর্থহীন। খুবই আন্তরিকতার সাথে তারা মনে করেন জীবন ধারণের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন এবং তাই তারা ঈশ্বর বিহীন মহাবিশ্বের সম্ভাবনার ধারণা

বাতিল করে দেন। সে কারণে তাদের কাছে শুধুমাত্র কারো হাতে তৈরি মহাবিশ্বই সত্য। এবং তাই তারা মনে করেন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্ত গুলোকে তাদের "সত্য"কেই সমর্থন করতে হবে, এর অন্যথা হওয়া চলবে না।

যাই হোক, আদর্শ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের প্রধান শর্তই হচ্ছে যে সব কিছু নিয়েই প্রশ্ন করা যাবে। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, সে সব পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তোলা যাবে। যে কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই কিছু না কিছু পূর্বধারণা বর্তমান থাকে। কিন্তু এই ধারণা গুলো সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। যখন আরো শক্তিশালী ও সঠিক ধারণা পাওয়া যায় তখন পূর্বধারণা গুলো বদলে যায়। কিন্তু সংরক্ষণবাদীরা, তাদের বিশ্বাসে অনড় থেকে আদর্শ বিজ্ঞান চর্চার মূল বিষয়কে এড়িয়ে গিয়ে যখন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্তকে ডিজাইনার ইউনিভার্স বা পরিকল্পিত মহাবিশ্বের ধারণার মধ্যেই চেপে রাখতে চাইছেন, তারা আসলে বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের চর্চা করছেন।

ধর্মবিশ্বাসীদের মতে বিগ ব্যাং তত্ত্ব "প্রমাণ" দিচ্ছে যে মহাবিশ্ব একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক এরকম কথাই লেখা আছে বাইবেলের (ব্যাবিলনীয়) পাতায়। একদম শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং মহাবিশ্বেরও একজন সৃষ্টিকর্তা দরকার। কিন্তু এই সৃষ্টিকর্তাকে আসতে হচ্ছে একেবারে শূন্য থেকে। কারণ মহাবিশ্ব যে ধরণের "লজিক" মেনে চলে ঈশ্বর তার চেয়ে ভিন্ন ধরণের "লজিক" মেনে চলেন। এই বিশেষ ধরণের লজিকে ঈশ্বরের শ্রষ্টা লাগে না। অবশ্য ঈশ্বরের জন্য শ্রষ্টার দরকার কেন নেই, বা মহাবিশ্বও কেন ঈশ্বরের মত শূন্য থেকে সৃষ্ট হতে পারবে না সে সম্পর্কে থিওলজিয়ানরা পরিষ্কার করে কখনোই কিছু বলেন না।

ধর্ম-বিশ্বাসী সংরক্ষণবাদীরা বুঝতে পেরেছেন যে তাঁরা কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না যে ঈশ্বর আছেন। তাঁরা শুধু এটুকুই গভীর ভাবে বিশ্বাস করে থাকেন যে মহাবিশ্বের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মের সমন্বয় শুধুমাত্র ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইনের পক্ষেই রায় দেয়। কিন্তু তাদের জন্য দুঃখজনক হলেও সত্য যে বিজ্ঞান কোন ধরণের গভীর বিশ্বাসের প্রতিই কোন সহমর্মিতা দেখায় না, তা সে বিশ্বাস যতই আন্তরিক হোক না কেন। মহাবিশ্ব নিজের নিয়মেই চলছে চলবে। কে কী ভাবছে বা কী বিশ্বাস করছে তাতে মহাবিশ্বের কিছুই যায় আসে না। আমাদের টেলিস্কোপগুলো দিনের পর দিন একটা সত্যই প্রতিষ্ঠা করে চলেছে যে, পৃথিবী হলো বিশাল সাহারা মরুভূমির বুকে এক কণা বালির মত। এর বাইরে আর কিছু আমরা ভাবার ক্ষমতাও মানুষের নেই। আমাদের এই সত্য মেনে নেয়া উচিত এবং সেটা মেনে চলার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

অবিশ্বাসীরা বুঝতে পেরেছেন যে তারা ঈশ্বর যে নেই তা প্রমাণ করতে পারবেন না। তাঁরা শুধু এটুকুই বলতে পারেন যে ঈশ্বর বিহীন মহাবিশ্বের ধারণাই হলো সবচেয়ে সুবিধাজনক ও গ্রহণযোগ্য। সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্ত এই ধারণার পক্ষেই রায় দেয়। কোন কারণ ছাড়াই বা কোন ধরণের পরিকল্পনা ছাড়াই হঠাৎ একেবারে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এ ধারণা মেনে নিলে পদার্থবিদ্যার একটি সূত্রকেও অমান্য করা হয় না। মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ হিসেব করলে দাঁড়ায় শূন্য। সুতরাং "শূন্য" থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হতে গেলে অন্য কোন অলৌকিক শক্তির ভেলকিবাজির দরকার হয় না। অনুরূপ ভাবে মহাবিশ্বের নিয়মগুলো

তৈরি হবার জন্যেও কোন ধরণের অলৌকিকতার দরকার হয় নি। বস্তু জগতে স্বতস্ফূর্ত নিয়ম খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

জীবন সুরে বাঁধা

সাম্প্রতিক বছর গুলোতে একটা ব্যাপার খুব মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মনে করা হচ্ছে যে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের লক্ষ্যে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে "সূক্ষ্ম সুরে" (Fine Tuning) বেঁধে দিয়েছে কেউ। ধর্মবিশ্বাসীদের পাশাপাশি অনেক বিজ্ঞানীও এই ধারণায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। আসলে বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ে সম্প্রতি যত আলোচনা হচ্ছে তার মধ্যে এই সূক্ষ্ম সমন্বয়ের-এর প্রতি যতটা মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে সেরকম আর কোন কিছুর প্রতি হয়নি।

"সূক্ষ্ম সুর"ই বলুন কিংবা "সূক্ষ্ম সমন্বয়"ই বলুন - এ ধরনের প্রশ্নে যুক্তি তর্ক শুরু হয়েছে মূলত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিতে, যেগুলোকে বলা হচ্ছে নৃকেন্দ্রিক সমাপতন বা "এনথ্রপিক কোইন্সিডেন্স"। আসলে তারা বলতে চায় যে মহাবিশ্ব এখন যেভাবে আছে, এর মৌলিক ধ্রুবক গুলির মান খুব সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই মহাবিশ্বে জীবন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, যেমন কার্বন, অক্সিজেন ইত্যাদির উৎপত্তি হতো না। প্রাণের উৎপত্তির পরিবেশই তখন সৃষ্টি হতে পারতো না।

"সূক্ষ্ম সমন্বয়"-এর ধ্বজাধারীরা মনে করেন যে শুধুমাত্র এক ধরণের প্রাণের বিকাশই সম্ভব। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ও ধ্রুবক মেনে নিয়ে প্রচলিত প্রাণসত্ত্বার চেয়ে ভিন্ন ধরণের প্রাণের বিকাশও সম্ভব। যে ব্যাপারটা সবচেয়ে জরুরি তা হলো নক্ষত্রগুলোর পর্যাপ্ত সময় ধরে টিকে থাকা - যাতে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলগুলো উৎপন্ন হতে পারে। এবং প্রাণের মত জটিল একটি নন-লিনিয়ার সিস্টেমের উদ্ভব ঘটতে পারে। আমি নিজে পদার্থবিজ্ঞানের অনেকগুলো ধ্রুবকের মান ইচ্ছামতো বহুগুণ বদলে দিয়ে সেই নতুন ধ্রুবক গুলো ব্যবহার করে একটি নতুন মহাবিশ্ব তৈরি করা সম্ভব কিনা দেখেছি। হিসেব কষে দেখেছি মহাবিশ্বের অবস্থা তখন কেমন হয়। প্রায় সব ধরণের ধ্রুবক বদলে দিয়েও মহাবিশ্ব গড়া সম্ভব, এবং তখনকার নক্ষত্রগুলোর আয়ু দেখা গেছে একশ কোটি বছরেরও বেশি। এ ধরণের সম্ভাব্য সব মহাবিশ্বেই প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব।

সমীকরণের ঈশ্বর

সাম্প্রতিক সংলাপগুলোতে আরো এক ধরণের যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের সমীকরণগুলো থেকে প্লেটোনিক মহাবিশ্বের আলামত পাওয়া যাচ্ছে, যে মহাবিশ্ব আমাদের পরিচিত মহাবিশ্বের চেয়ে আরো উন্নত।

খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকদের সাম্প্রতিক চালচলন ও বিজ্ঞানের প্রতি তাদের একটা সমঝোতার মনোভাবের কারণে খ্রিস্টান ধর্ম এখন এমন একটি অবস্থানে চলে এসেছে যেখানে প্রাকৃতিক নিয়মের মাঝখান থেকেই ঈশ্বর খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্য এই ঈশ্বর খুঁজতে গিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো যে স্থান, কাল এবং বস্তুর

ধর্মের উপর নির্ভরশীল তা তারা মনেই রাখছেন না। আসলে, ঈশ্বরের ব্যাপারে আধুনিক কালের পশ্চিমা ধাচের থিওলজিক্যাল মনোভাব সিস্টিন চ্যাপেলের সিলিং-এ আঁকা সাদা দাড়িওয়ালা জিওভা/জিউস বা দেয়ালে আঁকা দাড়িছাড়া জেসাস/এপোলোর চেয়ে সম্ভবত প্লেটোনিক ধাঁচের ঈশ্বরের বেশি কাছাকাছি।

কিছু কিছু বিজ্ঞানী ও ধর্মতাত্ত্বিক সাম্প্রতিক কালে যে ব্যাপারে একমত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তা হলো কোয়ার্ক, পরমাণু, পাথর, গাছপালা, গ্রহ-উপগ্রহ বা নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে পরম বাস্তবতার ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। আসলে পরম বাস্তবতা নিহিত আছে গাণিতিক বিশুদ্ধতা এবং পদার্থবিজ্ঞানের সমীকরণের মধ্যে। পরম ঈশ্বর তখন এসব সমীকরণ ও গাণিতিক বিশুদ্ধতার মধ্যে সহাবস্থান করেন যা সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে জানা সম্ভব আমাদের সামনে তাঁর শারীরিক উপস্থিতি দ্বারা নয়, বরং প্লেটোনিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তাঁর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। আমাদের অস্তিত্ব আসলে "ঈশ্বরের মন"-এ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অতীতের যৌক্তিক মতপার্থক্যগুলোর বেশির ভাগই দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এসব তর্কবিতর্কে শুধুমাত্র যুক্তির খাতিরে যুক্তির ব্যবহার করা হয়, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপর খুব একটা জোর দেয়া হয় না। তাই এসব তর্ক বিতর্কে বিজ্ঞানীরা মোটেও মনযোগ দেন নি, তা সে বিজ্ঞানী ঈশ্বরে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যাই হোন না কেন। এখন সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা দাবী করছেন যে তাঁরা গতানুগতিক ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি দেখাচ্ছেন না আর, বরং তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও সমীকরণগুলোতে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাচ্ছেন।

পল ডেভিস যেমন বলেছেন, "আসল কথা হলো, এই যে মহাবিশ্ব সৃষ্টিশীল, এই যে বিশ্বের নিয়মনীতিগুলো এমন সব জটিল জটিল কাঠামো তৈরি করার জন্য উপযুক্ত, এসব থেকে একটা বিষয় মনে আসে এবং ক্রমশ তা একটি বোধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে - অন্য ভাবে বলা যায়, এই যে মহাবিশ্ব নিজের ভেতর একটা নিজস্ব সতর্কতার ব্যবস্থা করে নিয়েছে - এটাই আমার কাছে শক্তিশালী আলামত যে 'একটা কিছু আছে' এই সব কিছুর পেছনে। এই যে পরিকল্পনা বা ডিজাইন করে দেয়ার ধারণা - এটা আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ"। খেয়াল করা দরকার যে পল ডেভিসের উক্তিতে "প্রমাণ (proof)" এর বদলে "আলামত (evidence)" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

তবুও, প্লেটোনিক ঈশ্বরের সাথে বাইবেলের ঈশ্বর বা অন্য কোন কাল্পনিক বা ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কোন মিল নেই। এবং সমীকরণগুলোকে কোন ধরণের দেবতার প্রতিনিধিত্ব করতে হয় না। এটা সত্য যে প্লেটোনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম ফিল্ড ও 'স্পেস-টাইম মেট্রিক টেনসর' কোয়ার্ক ও ইলেকট্রনের চেয়ে "বেশি বাস্তব" মনে করে। বিপরীতক্রমে বস্তুগত পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে কোয়ার্ক ও ইলেকট্রন মেট্রিক টেনসর বা অন্য কোন ফিল্ডের চেয়ে বেশি বাস্তব। কারণ এগুলো মানুষের তৈরি। কিন্তু প্লেটোনিক বা বাস্তবিক দু'শিবিরেরই বেশির ভাগ বিজ্ঞানী দু'ধরণের সম্ভাবনার কোনটিকেই দেবতা মনে করছেন না। তাদের কোন পক্ষই মনে করেন না যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও প্রাণের উদ্ভবের জন্য একটি "অলৌকিক ভেলকিবাজী"র দরকার আছে।

গোঁজামিলের ঈশ্বর

গোঁজামিল দেয়ার জন্য এখনো ঈশ্বরের খোঁজ পড়ে। এতেই বোঝা যায় যে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমঝোতা তৈরি হচ্ছে বলে যে দাবী করা হচ্ছে তা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ইতিহাসের দিকে তাকান। বিজ্ঞান সব সময় তার পর্যবেক্ষণ গুলো ব্যাখ্যা করেছে লৌকিক বা প্রাকৃতিক (অলৌকিক বা অপ্রাকৃত নয়) ধারণা বা মতবাদের মাধ্যমে। কিন্তু বিজ্ঞান যেখানে কোন ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি বা চুপ করে থেকেছে ধর্ম সবসময়েই সেখানে অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা এনে হাজির করেছে গোঁজামিল দিয়ে ব্যাখ্যাবিহীন ফাঁকগুলো পূরণ করার জন্য। যে কোন ক্ষেত্রেই একটা ব্যাখ্যাই টিকে থেকেছে - তা হলো মানুষের পর্যবেক্ষণ।

প্রাচীন যুগের অরণ্যবাসী সাধুরা মনে করতেন যে পাহাড়ের চূড়া থেকে পাথর গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবার কারণ হলো জ্বিন-পরীর কাজ। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ বলের ব্যাখ্যা আসার আগ পর্যন্ত এরকমই চলছিল। পুরোহিতরা মনে করতেন যে "ঈশ্বর" মানুষকে তাঁর নিজের আদলেই তৈরি করেছেন। কিন্তু ডারউইন এসে যখন বললেন যে মানুষ আসলে বিবর্তিত হয়েছে বানর প্রজাতির অনুরূপ থেকে তখন সব বদলে গেলো। এখন নতুন প্রজন্মের "ধার্মিক-বিজ্ঞানী" (সায়েন্টিস্ট-থিওলজিয়ান) এসে আবার তর্ক শুরু করেছে এই কারণে যে বিজ্ঞান এ ধারণার পুরোপুরি ব্যাখ্যা দিতে পারছে না এখনো। এবং তাই তারা বলতে পারছে যে, এখনো আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য জায়গা রয়ে গেছে। আমরা ব্যাখ্যা করে বলতে পারছি না যে কেন প্রকৃতির অনেক গুলো ধ্রুবকের মান এমন। তখন মনে হতে পারে যে ঈশ্বরই এমন ভাবে তৈরি করেছেন। আমরা "গণিতের অযৌক্তিক কার্যকারিতা" ব্যাখ্যা করতে পারছি না, তাই মনে হচ্ছে হয়তো ঈশ্বরই গণিত সৃষ্টি করেছেন।

হয়তো বা। কিন্তু এই আধুনিক গোঁজামিলের ঈশ্বর কি অরণ্যবাসী ফকির বা পুরোহিতদের ঈশ্বরের চেয়ে বেশি যৌক্তিক? বিজ্ঞান হয়তো একদিন এই ফাঁকগুলো পূরণ করে দেবে, এবং তা করবে ঈশ্বরকে ব্যবহার না করেই।

———————————————————

অনুবাদকের সংযোজনঃ

* Cosmic Background Explorer (COBE) স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করা হয়েছিল ১৯৮৯ সালের ১৮ নভেম্বর। নাসার (NASA) গোডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে এই বিশেষ স্যাটেলাইটটি তৈরি করা হয়েছিল মহাবিশ্বের উৎপত্তির প্রথম দিকের সময়কার ইনফ্রারেড ও মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশান সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে।

** ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক ডক্টর জর্জ এফ স্মুট ও নাসার সিনিয়র প্রজেক্ট সায়েন্টিস্ট ডক্টর জন ম্যাথের ২০০৬ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন কস্মিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশান সংক্রান্ত গবেষণার জন্য।

*** কোয়েকাররা শান্তিবাদী খ্রিস্টান ধর্মীয় সংগঠনের সদস্য যারা কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় আচার আচরণে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তারা মনে করেন শান্তি রক্ষায় ধর্মের ভূমিকা অসীম।

ড. ভিক্টর স্টেঙ্গর, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক, এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সংযুক্ত অধ্যাপক। তিনি 'কলোরাডো সিটিজেন অব সায়েন্সের' প্রতিষ্ঠাতা এবং মুক্তমনার একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি Not By Design: The Origin of the Universe, Physics and Psychics: The Search for a World Beyond the Senses, The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology, Timeless Reality:Symmetry, Simplicity and Multiple Universes, Has ScienceFound God? : The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe. সহ অসংখ্য বইয়ের প্রণেতা। তার সাম্প্রতিক বই God: The Failed Hypothesis—How Science Shows That God Does Not Exist নিউইয়র্ক টাইম বেস্ট সেলার।

ড. প্রদীপ দেব অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। ইমেইল - Pradip.Deb@utas.edu.au. প্রকাশিত বইঃ অস্ট্রেলিয়ার পথে পথে (২০০৫), আল্‌বুকারকি থেকে হলিউড (২০০৬), আইনস্টাইনের কাল (২০০৬)। তার এ লেখাটি অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গরের 'হ্যাজ সায়েন্স ফাউন্ড গড?' প্রবন্ধের অনুবাদ।